অসাধারণ

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

সীতানাথ ডাক্তারের দোকানে বসিয়া ছিলাম। সকালবেলা। খবরের কাগজ এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই—কারণ মফঃস্বল জায়গা। খবরের কাগজ না পৌঁছিলে যুদ্ধের আলোচনা ঠিক জমে না। অদূরবর্তী বাজারে প্রাভাতিক সওদা সারিয়া নবীন মুখুজ্যে, শশধর মুহুরি, কেনারাম মুখুজ্যে, মন্মথ মুখুজ্যে, বলাই দাঁ প্রভৃতি ভদ্রলোক সীতানাথের ডাক্তারখানায় স্নানাহারের সময় পর্যন্ত রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা কোনো চাকুরি করেন না। দু-একজন পেনশনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, এক-আধজনের বাপের পয়সা প্রচুর। ইঁহারা জার্মানি ওজাপানের সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন কথাবার্তা বলেন, যাহা স্বয়ং হিটলার, চার্চিল ও তোজোরও অজ্ঞাত। হিটলার কি ভুল করেন, চার্চিলের কি করা উচিত ছিল, জাপান এমনটি না করিয়া যদি এমনটি করিত তাহা হইলে কি ঘটিত—এ সকল মূল্যবান উপদেশ সর্বদাই সেখানে উচ্চারিত হইতেছে।

বর্তমানে কেনারাম মুখুজ্যে বলিতেছিলেন—আরে, এই তোমাকে বলি শোনো ভায়া। ভুলটা হিটলারের হল কোথায় শোনো।ডানকার্কের যুদ্ধের পরেই—

শশধর মুহুরি বলিয়া উঠিলেন—আঃ, আপনি ঐ এক শিখে রেখেছেন ডানকার্ক আর ডানকার্ক ! আসল ভুল সেখানে নয়, আসল ভুল হল—

এমন সময় একটি পুরুষের হাত ধরিয়া একজন স্ত্রীলোক ডাক্তারখানার বারান্দাতে উঠিয়া আসিল সম্মুখের রাস্তা হইতে। পুরুষটির বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোনো বয়েস হইতে পারে, রোগা, পরনে খাটো ময়লা ধুতি, মেয়েটির বয়েসও নিতান্ত কম নয়, তবে পুরুষটির অপেক্ষা অনেক কম, ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হইবে না। মেয়েটির পরনে তালি-লাগানো শাড়ি, কিন্তু ময়লা নয়—মুখশ্রী একসময় বেশ ভালোই ছিল বোঝা যায়, দেহ খুব সম্ভবত অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ।

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিল—ও ডাক্তারবাবু—

সীতানাথ ডাক্তার উহাদের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চাহিয়া বলিলেন—কি চাও ?

—বাবু, এঁকে একটুখানি দেখতি হবে।

সীতানাথ ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন ইহাদের দ্বারা বিশেষ কোনো অর্থাগমের আশা নাই—যত বড় কঠিন অসুখই হউক না কেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত চেহারা। পরনে তো ওই কাপড়। মাথা তৈলাভাবে রুক্ষ। রোগীর মধ্যে গণ্য করিয়া উৎফুল্ল হইবার কোনো কারণ নাই।

তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—হয়েচে কি ?

মেয়েটি বলিল—হবে আর কি, ওঁর জ্বর ছাড়ে না আজ দুমাস। তার ওপর মেহ। শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েচে। আমার উনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি দয়া করে দেখুন।—বলিয়া মেয়েটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—সরে এসো এদিকে—

পরে রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—হুঁ, দেখব কি, এর মধ্যে অনেক রোগ। কদ্দিন এমন হয়েচে ?

পুরুষটি এবার ক্ষীণসুরে বলিল—তা বাবু অনেক দিন। আমি আজ তিন-চার মাস ভুগচি। আর এই কাশি, এ কিছুতি যাচ্চে না—

মেয়েটি হাত তুলিয়া অধৈর্যের সুরে বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি ! খুব খ্যামোতা তোমার ! আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে তুমি—তিন মাস ওঁর ওসুখ—

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—ওর কথা শোনবেন না। ওঁর কি কিছু ঠিক থাকে ?নিজের দিকে ওঁর কোনো খেয়াল নেই—এই শুনুন তবে আমার কাছে—

কথাটা শোনাইল এভাবের, যেন লোকটি দার্শনিক কিংবা কবি অথবা ব্রহ্মদর্শী—সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে স্বভাবতই ইনি অনাসক্ত। বোধ হয় ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়াই সীতানাথ ডাক্তার পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—তোমার গনোরিয়া হয়েচে কতদিন ?

—তা বাবু চার-পাঁচ মাস হবে। সেবার যখন...

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি তো সব জানো কিনা ! চুপ করো ! না বাবু, দু বছর হয়ে গেল। আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা করে খেলে ওই মিঙ্গে ! কি জ্বালায় যে পড়েচি আমি, মরণ হয় তো হাড় জুড়িয়ে যায় আমার !

কাহার মরণ হইলে তাহার হাড় জুড়ায়, কথার ভাবে ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—বাড়ি কোথায় ?

মেয়েটি বলিল—বাড়ি এই ঝিটকিপোতায়। আমরা হাড়ি।

—ও ! ঝিটকিপোতায় হাড়ির বাস আছে নাকি ?

—না বাবু, দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্ছি ওই ওনারে নিয়ে। বিয়ে করা সোয়ামী, ফেলতে তো পারি নে ! আজ দুটি বছর উনি বিছেনেয় পড়ে। উঠতি হাঁটতি পারেন না। কত অসুদ-বিষুদ করলাম আমাদের দেশে ঘরে, যে যা বলে তাই করি, কিন্তু কিছুতেই সারাতি পারলাম না, দিন দিন যেন মানুষটা উঠতি পারে না, খেতি পারে না। তাই আজ বলি—ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—একটু দেখুন আপনি ভালো করে, আমার আর কেউ নেই।

আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার বলিলাম—তোমার স্বামী কি কাজ করে ?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কাজ ! ওরে আমার কাজের শিরোমণি রে ! ও করবে কাজ ?সেদিন পুবের সুয্যি পশ্চিম পানে ওঠবে না ?

পুরুষটি লজ্জিতভাবে বলিল—না বাবু, কাজ আমি করি নে। সে ক্ষ্যামতা নেই তো করব কি ?ও-ই ধান ভেনে দাইগিরি করে সংসার চালায়। তা এই বাজারে বড় কষ্ট হয়েছে বাবু।

মেয়েটি বলিল, তুমি থামবে বাপু, না বকে যাবে ?বাবু শুনুন তবে বলি। কষ্ট দুক্ষুর বার্তা ও কি জানে ! সংসারের কোনো খোঁজ রাখে ও ?

কৃতজ্ঞতার আবেগ বোধ হয় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল পুরুষটির। সে পুনরায় নম্র সুরে বলিল—তা যা বললে ও সে কথা সত্যি বটে। ও আমাকে জানতি দ্যায় না। নিজি সব করবে। আমি তো খাটতি পারি নে—আমার এই ডান পাডা একটু খোঁড়া, হাঁটতি পারি নে—এই দেখুন বাবু এই পাডা—

মেয়েটি আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—নাও, আর বাবুদের সামনে তোমায় পা বার করতি হবে না—

কিন্তু দেখিলাম মেয়েটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। এই গনোরিয়া-গ্রস্ত খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধের প্রতি এতটা দরদ ওর, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

সীতানাথ ডাক্তার বলিলেন—তুমি ধাইয়ের কাজ জানো বললে না ?

পুরুষটি এ-কথার উত্তর দিল। বলিল—খুব ভালো ধাই। তা যে বাড়ি যাবে, এক কাঠা করে চাল, একখানা করে কাপড়, একটি করে টাকা—ও-ই খরচ করে আমায় চিকিচ্ছে করাচ্চে বাবু।

মেয়েটি উহাকে থামাইয়া বলিল—তুমি চুপ করো দিকিনি ! তুমি কি জানো ওসবের ?বাবু, ধাইয়ের রোজগার আগে চলতো ভালোই। এখন আপনাদের এখানে হাসপাতাল হয়েচে পোয়াতিদের জন্যি। সব লোক এখানে আসে। আমাদের কাছে কেডা যাবে ?ধান ভেনে যা হয়। দু মণ ধান ভানলি পাঁচ কাঠা চাল পাওয়া

যায়— কিন্তু বাবু, অসুখে ভুগে ভুগে আমার গতর গিয়েচে,আর তেমন খাটতি পারি নে। ধান ভানা বড্ড খাটুনির কাজ। যেদিন ধান ভানি, আজকাল রাত্তিরি বড্ড পা কামড়ায়—

আমি বলিলাম—তোমার কে কে আছে আর ?

মেয়েটি সাফ উত্তর দিল—যম।

—জাতে হাড়ি বললে না ?

—হ্যাঁ বাবু।

—ঝিটকিপোতা থেকে এলে কি করে ?সে তো অনেক দূর !

—নৌকো করে অ্যালাম বাবু।

—ভাড়াটে নৌকো ?

—অনেক কেঁদে হাতে পায়ে ধরে তেরো গণ্ডা পয়সা ঠিক হয়েল। ওই আমাদের গাঁয়ের রতন মাজি। আমি তাকে ধরম বাপ বলে ডেকেচি।

—ধানের চাষ করো ?

—না বাবু, ঘর-দোর নেই তার ধানের জমি ! বিচুলির ছাউনি একখানা ঘর, তা এবার খসে পড়ছে। না খুঁচি দিলি এবার বর্ষায় সে ঘরে থাকা যাবে না।

বেলা হইয়াছিল। সেদিন চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে প্রায়ই দুদিন অন্তর মেয়েটি উহার স্বামীর হাত ধরিয়া ডাক্তারখানায় হাজির হয়। কখনো ঔষধের দাম কমাইবার জন্য সীতানাথ ডাক্তারের হাতেপায়ে পড়ে, কোনোদিন স্বামীর সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করে, কবে রোগ সারিবে, নৌকাভাড়া দিয়া আর পারে না সে—ইত্যাদি।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওকে কেমন দেখেন ?ওর রোগ সারবে ?

সীতানাথ ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাস তো হয় না। নানান উপসর্গ। ওর শরীরে কিছু নেই—তবে চেষ্টা করচি, এই যা।

অবশ্য উহাদের সাক্ষাতে এ কথা হয় নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি, মেয়েটি আরো শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন এমনধারা চলিলে ইহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। হয়তো নিজে আধপেটা খাইয়া স্বামীর ঔষধপথ্য ও নৌকাভাড়া যোগাইতেছে। পরনের বস্ত্রও জীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। সেদিনের কাজ শেষ করিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিলাম—শোনো এদিকে !

—কি বাবু ?

—ধাইয়ের কাজ করতে পারবে ?

সে হাসিয়া বলিল—ঐ কাজই তো করি বাবু, তা আর পারব না ?

আমি উহাদের সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উদ্দেশ্য আমার বাসাটা তাহাকে চিনাইয়া দেওয়া। সে মাসেই আমার বাসাতে ধাত্রীর প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। পথে মেয়েটি বলিল—দিন না বাবু একটা কাজ জুটিয়ে। বড় কষ্টে পড়িচি এনাকে নিয়ে। এক এক শিশি ওষুধ পাঁচ সিকে দেড় টাকা। আমার রোজগার বড্ড মন্দা হয়ে গিয়েচে। আর চালাতি পিরচি নে। দিন একটা জুটিয়ে, যা দেবে তাই নেব। এক কাঠা চাল, একখানা কাপড়, আর না হয় আট আনা পয়সা দেবে—তাই নেব। আমার খাঁই নেই বাবু অন্য ধাইয়ের মতো। তা বাবু আমি রাত্তিরি আঁতুড়ে থাকব, সেঁক তাপ করব, ছাড়া কাপড় কাচব—

অনুনয়ের সুরে বলিল—দিন একটা কাজ জুটিয়ে—

আমি বলিলাম—ওই আমার বাসা। আর দিনআষ্টেক পরে আমার বাসাতে দরকার হবে ধাইয়ের। চলো আমার সঙ্গে, দেখিয়ে আনি। ওকে এখানে বসিয়ে রাখো।...পুরুষটিকে বলিলাম—তুমি এই গাছতলায় বসে থাকো, বুঝলে ?

বাড়িতে আনিয়া ধাইকে দেখানো হইল। কিন্তু বাড়িতে ও ধাই পছন্দ হইল না, অজুহাত অবশ্য পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাই, উহাদের কি জ্ঞান আছে— ইত্যাদি। কিন্তু আমার সন্দেহ হইল, আসল কারণ মেয়েটি দেখিতে ভালো এবং আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি বলিয়া।

পরদিন আবার রাস্তায় দেখা তাহাদের সঙ্গে। ডাক্তারখানায় দুজনে চলিয়াছে।

আমাকে মেয়েটি ডাকিয়া বলিল—ও বাবু, শুনুন—

আমি তাহার কিছু না করিতে পারিয়া লজ্জিত ছিলাম। বলিলাম—বলো—

—আপনার বাড়িতে হল না ?

—ইয়ে—না—ওদের সঙ্গে কমলা ধাইয়ের কথাবার্তা আগেই হয়ে গিয়েছে কি না। তাই—

—যাক্ গে বাবু। আপনি অন্য এক জায়গায় জুটিয়ে দিন না ?

—দেখব। আরো এক জায়গায় সন্ধান আছে আমার।

-দেখুন। তিনিই দয়া করবেন। চরিতামৃতে প্রভু বলেচেন—

হাড়ির মেয়ের মুখে এ-কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পড়ো ?লেখাপড়া জানো নাকি ?

পুরুষটি বলিল—ও জানে।

—বইখানা আছে নাকি তোমাদের বাড়ি ?

—আছে বাবু, ও রোজ পড়ে আমাকে সোনায়। বই পড়ে আর কাঁদে।

মেয়েটি সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—তোমার অত ব্যাখ্যান করতি হবে না, চুপ করো। না বাবু, ওর কথা শোনবেন না। পড়ি একটু একটু সন্দেবেলাডা। তা ও বই পড়ে চোখ বোজবার মতো অদেষ্ট কি আমাদের আছে বাবু ?

—লেখাপড়া শিখলে কোথায় ?

উহার স্বামী বলিল—ওর মামারবাড়ি ছেল ধরমপুকুর। শুয়োরের ব্যবসা ছেল মস্ত। অবস্থাও ছেল ভালো। এখন তাদের কেউ নেই, মরে হেজে গিয়েচে—নইলে আজ এমন দুর্দশা হবে কেন ওর বাবু ?ও ছেলেবেলায় মামাদের কাছে থেকে ইস্কুলি নেকাপড়া করেল।

—কি ইস্কুল ?

বউটি ইহার উত্তর দিল, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুরুষটির সাধ্যাতীত। অতি জটিল প্রশ্ন।

—আপার প্রাইমারি ইস্কুল বাবু।

—পাস করেছিলে ?

—হুঁ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে গিইছিলাম।

উহার স্বামী সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বাবু, ও পাস করে দু টাকা ইস্কলাসি পেয়েল।

বউ ধমক দিয়া উঠিল—তুমি চুপ করো দিকিনি।

পুরুষটি তখনো ঝোঁক সামলাইতে পারে নাই। বলিল—বাবু, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আর নেকাপড়া হল না ওর। মামারাও মরে হেজে গেল। ও যেমন মেয়ে, আমার হয়েচে সেই যারে বলে—বানরের গলায় মুক্তোর মালা ! সব অদেষ্টের ফল আর কি ! আমি ওরে খেতি দেব কি, আমি অসুখে পড়ে পর্যন্ত ওই আমারে খেতি দ্যায়। আমার এই চিকিচ্ছেপত্তর ওই সব চালাচ্চে। আজকাল রোজগার নেই ওর—পেটভরে দুটো খেতিও পায় না—আমারে বলে, তুমি সেরে উঠলি আমার—

বউ আবার কড়া ধমক দিয়া উঠিল—আবার ! বাবুর সামনে ওই সব কথা ?চলো বাড়ি তুমি—ঝাঁটা মারব তোমার মুখি—তোমার খুব মুরোদ ! মুরোদের আবার ব্যাখ্যানা হচ্চে—লজ্জা করে না তোমার ?

আমি মধ্যস্থতা করিয়া বলিলাম—কেন, ও তো ভালোই বলচে। ওর যা ভালো লেগেচে, ভালো বলবে না ?

বউ সলজ্জ সুরে বলিল—না বাবু, যেখানে সেখানে ওসব কথা কে বলতে বলেচে ওকে ?

—তা বলুক। কোনো দোষ হয়নি।

—বাবু, আমারে দেন একটা কাজ জুটিয়ে—

—চেষ্টা করব। একটু অপেক্ষা করো, দেখি দু-একদিন।

—কাজ না পেলি বড় কষ্ট হচ্চে। ধান ভানতি শরীর আর বয় না। দু-মণ করে ধান না ভানলি এই যুদ্ধুর বাজারে দুটো লোকের খাওয়া হয় ?তাও বাবু শুধু খাওয়া- পরা এ থেকে হয় না। একখানি কাপড়ে ঠেকেচে। একটা আঁতুড়ের কাজ জুটলি তবু একখানা কাপড় পাব।

কয়েকদিন ধরিয়া তাহাদের আর দেখিলাম না। কাজও কিছু জুটাইতে পারা গেল না। কাহার বাড়িতে কে অন্তঃসত্ত্বা আছে এ সংবাদ জোগাড় করা আমার কর্ম নয় দেখিলাম।

এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিন দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোনো গৃহস্থবাড়িতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটুবেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু-হাতে ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া মরিতে শুরু করিল তাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডুবাবুরা ও দাঁ-বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্ধোলঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভালো বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

এই মহাদুর্যোগের হিড়িকে কত লোককে তলাইয়া যাইতে দেখিলাম। কতবার মনে ভাবিয়াছি ওই মেয়েটির কথা। ধান ভানিয়া রুগ্‌ণ স্বামীর চিকিৎসা চালাইত। নৌকাভাড়া করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া আসিত ডাক্তারখানায়। চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলিত। তাহাদের আর পথেঘাটে দেখি নাই অনেকদিন। সীতানাথ ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম। সীতানাথ বলিলেন—না, তারা অনেকদিন আসেনি। আর আসবে কি, এই তো কাণ্ড ! ওষুধের দাম দিতে পারে না—ক-শিশি ওষুধের দাম এখনো বাকি...

অনেকদিন উহাদের দেখি নাই। প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি।

ভাদ্রমাসের দিকে আমাদের মহকুমার রিলিফ কমিটির যত্নে লঙ্গরখানা খুলা হইল। সেখানে প্রত্যহ বহু দুঃস্থ নরনারী লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খাইতে আসিত। উহাদের মধ্যে একদিন আবার মেয়েটিকে দেখিলাম। একটা মালসায় করিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছে।

আমি ডাকিয়া বলিলাম—তুমি কোথায় এসেছিলে ?

আমায় দেখিয়া সে লজ্জিত হইল।

বলিল—এই—

—তোমার স্বামী কোথায় ?

—ওই পুরনো ডাকঘরের পেছনে বটতলায়। আজকাল হাঁটতি পারে না মোটে।

—চলো দেখে আসি।

কৌতূহল হইল দেখিবার জন্য, তাই গিয়াছিলাম। গিয়া মনে হইল, না, আসিলে আমাকে বড় ঠকিতে হইত—কারণ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুরনো পোস্টাফিসের পিছনে যেখানে গবর্নমেন্টর কলেরা ওয়ার্ডের ঘর, তার সামনেবটতলায় এক ছেঁড়া চাটাই পাতিয়া বউটির খোঁড়া স্বামী শুইয়া আছে। মনে হইল লোকটা চাটাইয়ের সঙ্গে মিশিয়া আছে, এত রুগ্ণ। মেয়েটি তার পাশে বসিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি তাহাকে খাওয়াইতেছে। দুপুরবেলা, রাস্তা দিয়া অনেক লোকে যাতায়াত করিতেছে, কেহ চাহিয়া দেখিতেছে, কেহ দেখিতেছে না। খাওয়ানো শেষ হইলে সে কলেরা ওয়ার্ডের কম্পাউন্ডের টিউবওয়েল হইতে শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া স্বামীর মুখে নিংড়াইয়া দিল। লোকটা হাঁ করিয়া দু ঢোঁক জল গিলিয়া বলিল—আর একটু খাব—

মেয়েটি আবার গেল টিউবওয়েলের কাছে, আবার শাড়ির আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া ওর মুখে দিল। আমি কখনো এমন দৃশ্য দেখি নাই।

বলিলাম—অমন করে জল আনচো কেন ?

মেয়েটি বাঁ-হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—ঘটিবাটি কিছু নেই, কিসে জল আনি ?

—কেন মালসাটা ?

সে মালসাটা তুলিয়া আমার কাছে আনিয়া দেখাইল। বলিল—সবটা খেতে পারেনি, আধমালসা রয়েচে। রাত্তিরে দেব। খাওয়া কমে গিয়েচে একেবারে।

তারপর মালসাটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া বলিল—বড় কষ্ট হয়েচে বাবু—দিন না একটা কাজটাজ জুটিয়ে ?এক কাঠা চাল শুধু—খুব কমের মধ্যে করে দেব—

এই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ !